যুগান্তর

তারিখ ... 29 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ......

ছোটদের বড় পরীক্ষা কতটা যৌক্তিক?

মো. জামাল উদ্দিন

শেষ হল ছোটদের বড় পরীক্ষা— প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। এ বছর সারা দেশে প্রাথমিকে প্রায় ২৮ লাখ ৬২ হাজার ৭৯ জন এবং ইবতেদায়ীতে প্রায় ২ লাখ ৯৪ হাজার ৬২১ জনসহ সর্বমোট ৩১ লাখ ৫৬ হাজার ৭০০ জন ক্ষুদে শিক্ষার্থী পরীক্ষা নামক যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য নিবন্ধিত হয়েছিল। তবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২৯ লাখ ৬৭ হাজার ৮০ জন, যার শতকরা হার ৯৩.৯৯%। তার মানে ৬.০১% শিক্ষার্থী অর্থাৎ প্রায় ১ লাখ ৮৯ হাজার ৬২০ জন এ বছর প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডিই পার হতে পারল না। এছাড়া প্রতি বছর ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যায় ৪% থেকে ৫% শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়। তার মানে আরও কিছু শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। এই ঝরে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে— 'ছোট ছোট কোমলমতি শিক্ষার্থীর পরীক্ষাভীতি, পারিবারিক অস্বচ্ছলতা, শিক্ষার অপ্রতুল পরিবেশ, পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতায়াত অসুবিধা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা 'সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ' মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের চেয়ে দেখা যায় অভিভাবকরাই বেশি মনোযোগী। সন্তানকে জিপিএ-৫ পেতেই হবে— এ মনোভাব থেকে ছোট ছোট শিক্ষার্থীর ওপর প্রচণ্ড মানসিক চাপ দিতেও তারা কুণ্ঠা বোধ করেন না। আর স্কুলগুলোও জড়িয়ে পড়ে এক অসুস্থ প্রতিযোগিতায়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর অনেক স্কুল বড় বড় ব্যানার লেখে— প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় শতভাগ জিপিএ- ৫ অর্জন। বস্তুত এসব ব্যানারে ছেয়ে যায় শহর-গ্রামের অলিগলি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ১০-১২ বছরের ছেলেমেয়েরা এক কঠিন এবং অসুস্থ প্রতিযোগিতার বেড়াজালে আটকে যাচ্ছে।

পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রেই তারা পড়ছে প্রচণ্ড মানসিক চাপে। মূলত বছর শেষে এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সারা বছরই শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপের মধ্যে থাকে। জিপিএ-৫ পাওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতায় স্কুলগুলো সারা বছরই ক্লাস টেস্ট, মডেল টেস্ট ইত্যাদি পরিচালনা করে থাকে। নভেম্বরে তাদের পরীক্ষার আগে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর এই দশ মাসে কোনো কোনো স্কুলে শিক্ষার্থীদের অন্তত ৮ থেকে ১০ বার বিভিন্ন নামের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। এতেই বোঝা যায়, তারা কতটা মানসিক চাপে থাকে! এতে করে কী হয়? তাদের শৈশব কেড়ে নেয়া হয় একটি বছরের জন্য।

শিক্ষকতা করার সুবাদে পরীক্ষা কেন্দ্রে এবং পরীক্ষা কক্ষে এসব কোমলমতি শিক্ষার্থীদের এক ধরনের ভয়ার্ত চেহারা দেখতে পেয়েছি। তাছাড়া আমি নিজেও একজন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থীর পিতা। ছেলের পরীক্ষার আগে শুধু তার সাহস জোগানোকেই কয়েকদিনের জন্য ব্রত হিসেবে নিয়েছিলাম। এ অবস্থা শুধু আমার নয়, বোধকরি প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর বাবা-মায়েরই। আমার ছেলের প্রশ্ন হল—

: তোমরা ছোটবেলায় এ ধরনের পরীক্ষা দিয়েছ কি?

জবাবে বললাম—

: না। তবে বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছিলাম আর সেটা সবার জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না।

ছেলের পাল্টা প্রশ্ন—

: তাহলে আমাদেরকে কেন বাধ্যতামূলকভাবে এ পরীক্ষা দিতে হচ্ছে?

জবাবে বললাম—

: পরীক্ষা দিলে সাহস বাড়ে। তুমি এক স্কুলের ছাত্র হয়ে অন্য স্কুলে গিয়ে ভিন্ন পরিবেশে পরীক্ষা দেবে। এর ফলে তুমি ভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে এবং নিজেকে মানিয়ে নিতে শিখবে।

পুনরায় ছেলের প্রশ্ন—

: তোমরা কি তাহলে ভীতু ছিলে? তোমরা ভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে পারনি? নিজেকে মানিয়ে নিতে পারনি?

এবার আর ফসকে যাওয়ার কোনো সুযোগ পেলাম না। ছেলের প্রশ্নজালে আটকে গেলাম। আসলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার যৌক্তিকতা কতটুকু— তা নিয়ে ভাববার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের শিক্ষানীতিতেও এই বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য এ ধরনের পরীক্ষার কোনো অস্তিত্ব নেই। তাহলে আমরা কেন এ পরীক্ষার নামে অহেতুক ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, প্রশাসন সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি? কেন আমরা আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা নামের যুদ্ধে ঠেলে দিচ্ছি? কেন 'পরীক্ষা জালে' আটকে আমরা তাদের শৈশব থেকে একটি বছর কেড়ে নিচ্ছি?

সিনিয়র শিক্ষক ও সিনিয়র একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ (থানা পর্যায়ে ২০১৬ ও ২০১৭ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত)